ইউনিট ৭

গবাদিপশুর নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা

গবাদিপশু নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা এমন একটি বিষয় যা পশুর খাদ্য, যত্ন ও প্রজননের সমুদয় কর্মকে বোঝায়। জন্মাবৃত্তান্ত, জন্মের পর থেকে বাড়ন্ত পশুর জৈবিক পরিবর্তনের ক্রম, যৌন পরিপক্কতা, দৈহিক উপযুক্ততা অর্জন ও এরপর প্রজনন কাজের মধ্য দিয়ে গবাদিপশুর জীবনচক্র অতিবাহিত হয়। এজন্য জন্মের পর থেকে বয়ঃসন্ধিক্ষণ পর্যন্ত পশুর জীবনে যে পরিবর্তন ও লক্ষণগুলো দেখা যায় অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। গবাদিপশুর শারীরিক ওজন, দাঁত ওঠা, বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে দাঁতের গঠন বা অন্যান্য দৈহিক পরিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একই সঙ্গে বিভিন্ন প্রয়োজনে গবাদিপশুকে ধরা, আটকানো বা নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতিগুলো পশু ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ইউনিট ৭-এর বিভিন্ন পাঠে গবাদিপশুর দৈহিক ওজন ও বয়স নির্ণয়, গবাদিপশুর নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ খরা ও বন্যায় গবাদিপশু সংরক্ষণে করণীয়, প্রভৃতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৭.১

ওজন ও বয়স নির্ণয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গবাদি পশুর দৈহিক ওজন নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা লিখতে পারবেন।
- গবাদিপশুর ওজন নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- দাঁত দেখে বিভিন্ন প্রজাতির গবাদিপশুর বয়স নির্ণয়ের পদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে গবাদিপশুর ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ খরা ও বন্যায় গবাদিপশু সংরক্ষণে করণীয় সম্পর্কে বলতে পারবেন।

গবাদিপশুর ওজন নির্ণয়

জন্মের পর থেকে প্রতিদিনই গবাদিপশুর শরীর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে দৈহিক ওজন বাড়তে থাকে। গবাদিপশুকে যে খাদ্য খাওয়ানো হয় তার একটি অংশ মলমূত্র হয়ে দেহ থেকে বের হয়ে যায় এবং বাকী অংশ দেহ গঠনে ব্যয় হয়। যে অংশ পশুর দেহ গঠনে ব্যবহৃত হয় তা গবাদিপশুর দৈহিক বৃদ্ধি ঘটায়। যে পশু দিন দিন খাবার খেয়ে বড় হয়ে ওঠে তার শারীরতত্ত্ব স্বাভাবিকভাবে চলে। গবাদিপশুর দৈহিক ওজন বিভিন্ন সময়েই পরিমাপ করতে হয়। যেমন- জন্ম, বয়ঃবৃদ্ধি, গরম হওয়া, যৌন পরিপক্কতা, অন্তঃসত্ত্বা হওয়া প্রভৃতি সময়। গরুমহিষের ওজন দু'ভাবে নির্ণয় করা যায়। যথা- ১. ওজন মাপার যন্ত্র বা তুলাদন্ডের সাহায্যে এবং ২. দৈর্ঘ্য ও বুকের বেড় পরিমাপের মাধ্যমে। গরুমহিষের ওজন তুলাদন্ডের সাহায্যে পরিমাপ করলে একেবারে নির্ভুল তথ্য পাওয়া যায়। যেখানে গরুমহিষ পালন করা হয় সেখানে একটি নিরাপদ স্থানে তুলাদন্ডটি মাটিতে স্থাপন করা যেতে পারে। গরুমহিষকে তুলাদন্ডের উপরে উঠিয়ে ওজন নিতে হয়। তুলাদন্ডের ব্যবস্থা না থাকলে দৈর্ঘ্য ও বুকের বেড় পরিমাপের মাধ্যমেও গরুমহিষের ওজন নির্ণয় করা যায়। তবে এক্ষেত্রে তুলাদন্ডের মতো নির্ভুল ওজন পাওয়া যাবে না। এ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ওজন প্রকৃতি ওজনের চেয়ে $\pm$ ৫% কমবেশি হতে পারে। এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত সূত্রটি নিম্নরূপ–

গরুমহিষের ওজন তুলাদন্ডের সাহায্যে পরিমাপ করলে একেবারে নির্ভুল তথ্য

$$\frac{L \times G^2}{10400} = \text{দৈহিক ওজন (কেজি)}$$

[এখানে, L = দৈর্ঘ্য (সেমি), G = বুকের বেড় (সেমি)]

দৈর্ঘ্য মাপতে হলে পশুকে শান্তভাবে সমতলে দাঁড় করাতে হবে। পশুর ঘাড় থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত দূরত্বটুকু দৈর্ঘ্য মাপার ফিতা বা ট্যাপের সাহায্যে সেমি-এ মাপতে হবে। এরপর বুকের বেড় সেমি-এ মেপে উপরোক্ত সূত্র অনুযায়ী হিসাব করে ওজন নির্ণয় করতে হবে।

গবাদিপশুর বয়স নির্ণয়

গরুমহিষ লালনপালন করার জন্য এদের বয়স নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে পশুর দৈহিক বৃদ্ধি, উৎপাদন ও কর্মক্ষমতার যোগসূত্র রয়েছে। যেমন- গাভী তৃতীয় বিয়ানে (প্রায় ৫-৬ বছর) সর্বোচ্চ পরিমাণ দুধ উৎপাদন করে। কাজেই পশুপালনকারী,

বয়স নির্ণয়ের নির্ভরযোগ্য উপায় হচ্ছে সকল গবাদিপশুর জন্মতালিকা প্রস্তুত করা ও তাতে জন্ম ও জন্ম পরবর্তী সকল তথ্য সন্নিবেশ করা।

প্রজননকারী, বিক্রেতা ও ক্রেতার জন্য পশুর বয়স জানা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়াও বয়সের তারতম্যের কারণে পশুর রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব ও তীব্রতার তারতম্য ঘটে। তাছাড়া পশুর রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা, দেহে সঠিকমাত্রায় ওষুধ প্রয়োগ প্রভৃতির জন্যও বয়স জানা প্রয়োজন। বয়স নির্ণয়ের নির্ভরযোগ্য উপায় হচ্ছে সকল গবাদিপশুর জন্মতালিকা প্রস্তুত করা ও তাতে জন্ম ও জন্ম পরবর্তী সকল তথ্য সন্নিবেশ করা। কিন্তু আমাদের দেশে পশুপালনে এখনও আধুনিকতার তেমন ছোঁয়া লাগেনি বলে গবাদিপশুর বয়স নির্ণয়ে আধুনিক কোনো পদ্ধতির প্রয়োগই হয় না। বর্তমানে এদেশের গ্রামেগঞ্জে, এমনকী খামার পর্যায়েও দাঁত দেখার মাধ্যমে গবাদিপশুর বয়স নির্ণয় করা হয়। দাঁত দেখার মাধ্যমে সব সময় সঠিকভাবে পশুর বয়স নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এ পদ্ধতিতে পশুর বয়স সম্বন্ধে অনুমান করা যায় মাত্র। কিন্তু এদেশে গবাদিপশুর বয়স নির্ণয়ে এ পদ্ধতিটিই বহুল প্রচলিত। এছাড়া শিং দেখেও গবাদিপশুর বয়স নির্ণয় করা যায়।

১. দাঁত দেখে বয়স নির্ণয়

গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি রোমন্থনকারী পশুর দাঁতের সাহায্যে বয়স অনুমান করার জন্য এদের দাঁত সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। রোমন্থনকারী পশুর দু'ধরনের দাঁত রয়েছে। যেমন– অস্থায়ী ও স্থায়ী দাঁত।

অস্থায়ী দাঁত

গরু মহিষের অস্থায়ী দাঁতের সংখ্যা ২০।

গবাদিপশুর প্রথম সেট দাঁতকে অস্থায়ী দাঁত (Temporary Teeth) বলে। জন্মের পর থেকেই এ দাঁত গজানো শুরু হয়। এমনকী রোমন্থনকারী গবাদিপশু জন্মের সময় বেশ ক'টি দাঁত নিয়ে জন্মায়। নির্দিষ্ট সময় ও নিয়মে ক্রমান্বয়ে প্রথম সেটের দাঁত পড়ে যায় ও দ্বিতীয় সেটের দাঁত গজায়। একারণে অস্থায়ী দাঁতকে দুধে দাঁত (Milk Teeth) বা পতনশীল দাঁত (Deciduous Teeth) বলে। গরুমহিষের অস্থায়ী দাঁতের সংখ্যা ২০। দেড় থেকে দু'বছর বয়সের পরে অস্থায়ী দাঁত পড়া শুরু করে ও নতুন স্থায়ী দাঁত (Permanent Teeth) গজায়।

স্থায়ী দাঁত

পশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্থায়ী দাঁত পড়ে যে নতুন দাঁত গজায় তাদের স্থায়ী দাঁত বলে। স্থায়ী দাঁতের সংখ্যা অস্থায়ী দাঁতের থেকে বেশি। গরুমহিষের স্থায়ী দাঁতের সংখ্যা ৩২।

গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি গবাদিপশুর উপরের চোয়ালের সামনের দিকে কোনো দাঁত নেই। বরং সেখানে একটি শক্ত প্যাড (Dental pad) থাকে। সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে মোট তিন ধরনের, যেমন– কর্তন (Incisor), চর্বন বা প্রাক-পেষণ (Premolar) এবং পেষণ (Molar) দাঁত থাকে। এদের কোনো ছেদন দাঁত বা শ্বাদন্ত (Canine teeth) থাকে না। গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার অস্থায়ী ও স্থায়ী দাঁতের সংখ্যা নিম্নলিখিত দন্তসূত্র দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে।

অস্থায়ী দাঁত $= 2 \times \left[DI\,\frac{0}{4}\,DC\,\frac{0}{0}\,DP\,\frac{3}{3}\,DM\,\frac{0}{0} \right] = 20$

স্থায়ী দাঁত $= 2 \times \left[I\,\frac{0}{4}\,C\,\frac{0}{0}\,M\,\frac{3}{3}\,DM\,\frac{0}{0} \right] = 32$

[এখানে, D = deciduous teeth বা অস্থায়ী দাঁত, I = Incisor teeth বা কর্তন দাঁত, C = Canine teeth বা ছেদন দাঁত, P = Premolar teeth বা প্রাক-পেষণ দাঁত এবং M = Molar teeth বা পেষণ দাঁত]

কর্তন দাঁতের মোট সংখ্যা ৮ এবং এগুলোকে মোট চারভাবে ভাগ করা যায়। যথা- কেন্দ্রিক, প্রথম মধ্যক, দ্বিতীয় মধ্যক এবং কৌনিক। প্রাক-পেষণ এবং পেষণ দাঁতকে একসঙ্গে চোয়ালের দাঁত বলে এবং এদের মোট সংখ্যা ২৪। প্রত্যেক চোয়ালে যথাক্রমে ৩টি করে প্রাক-পেষণ ও পেষণ দাঁত থাকে।

গরুমহিষের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে যেভাবে অস্থায়ী দাঁত ওঠে, সেগুলো পড়ে গিয়ে সেখানে স্থায়ী দাঁত গজায় বা স্থায়ী দাঁত ক্ষয় হয় তা সারণি ৭.১.১ ও ৭.১.২-এ দেখানো হয়েছে।

সারনি ৭.১.১ ঃ গরুমহিষের অস্থায়ী দাঁত ওঠা এবং সেগুলো পড়ে গিয়ে স্থায়ী দাঁত গজানোর বয়স

অস্থায়ী দাঁতের নাম	**দাঁত ওঠার বয়স**	**স্থায়ী দাঁতের নাম**	**স্থায়ী দাঁত গজানো বয়স**
অস্থায়ী কর্তন দাঁত (৮টি)–		***স্থায়ী কর্তন দাঁত (৮টি)–***	
কেন্দ্রিক কর্তন দাঁত	জন্মের পূর্বে	কেন্দ্রিক কর্তন দাঁত	১৪-২৫ মাস
প্রথম মধ্যক কর্তন দাঁত	জন্মের পূর্বে	প্রথম মধ্যক কর্তন দাঁত	১৭-৩৩ মাস
দ্বিতীয় মধ্যক কর্তন দাঁত	জন্মের পূর্ব থেকে ২-৬ দিনের মধ্যে	দ্বিতীয় মধ্যক কর্তন দাঁত	২২-৪০ মাস
কৌনিক কর্তন দাঁত	জন্মের পূর্ব থেকে ২-১৪ দিনের মধ্যে	কৌনিক কর্তন দাঁত	৩২-৪২ মাস
অস্থায়ী প্রাক-পেষণ দাঁত (১২টি)–		***স্থায়ী প্রাক-পেষণ দাঁত (১২টি)–***	
প্রথম প্রাক-পেষণ দাঁত	জন্মের পূর্ব থেকে ১৪-২১ দিনের মধ্যে	প্রথম প্রাক-পেষণ দাঁত	২৪-২৮ মাস
দ্বিতীয় প্রাক-পেষণ দাঁত	জন্মের পূর্ব থেকে ১৪-২১ দিনের মধ্যে	দ্বিতীয় প্রাক-পেষণ দাঁত	২৪-৩০ মাস
তৃতীয় প্রাক-পেষণ দাঁত	জন্মের পূর্ব থেকে ১৪-২১ দিনের মধ্যে	তৃতীয় প্রাক-পেষণ দাঁত	২৮-৩৪ মাস
		স্থায়ী পেষণ দাঁত (১২টি)–	
		প্রথম পেষণ দাঁত	৫-৬ মাস
		দ্বিতীয় পেষণ দাঁত	১৫-১৮ মাস
		তৃতীয় পেষণ দাঁত	২৪-২৮ মাস

সারনি ৭.১.২ঃ গরুমহিষের স্থায়ী কর্তন দাঁত ক্ষয় হওয়ার বয়স

দাঁতের নাম	গরুমহিষের বয়স (বছর)
কেন্দ্রিক কর্তন দাঁত	৬–৭
প্রথম মধ্যক কর্তন দাঁত	৭–৮
দ্বিতীয় মধ্যক কর্তন দাঁত	৮.০-৯.৫
কৌনিক কর্তন দাঁত	১১ বছরের মধ্যে

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ বার বছরের পর দাঁত ক্ষয়ে যাওয়ার কারণে গরুমহিষের দাঁতের প্রকারভেদ বোঝা সম্ভব হয় না।

২. শিং দেখে বয়স নির্ণয়

> জন্মের পর থেকে তিন বছর বয়সে গরু ও মহিষের শিং-এর গোড়ায় একটি চক্রাকার রিং বা গোলাকার দাগ দেখা যায়।

দাঁত দেখে গবাদিপশুর বয়স নির্ণয়ের মতো শিং দেখেও গরু ও মহিষের বয়স নির্ণয় করা যায়। তবে দাঁত দেখে বয়স নির্ণয়ের চেয়ে শিং দেখে বয়স নির্ণয়ের একটু কষ্টকর। সে কারণে দাঁত দেখে বয়স নির্নয় করাটাই উত্তম। শিং দেখে বয়স নির্ণয় করতে হলে শিংয়ের চক্রাকার দাগ বা রিংগুলো সূক্ষভাবে পরীক্ষা করতে হয়।

জন্মের পর থেকে তিন বছর বয়সে গরু ও মহিষের শিং-এর গোড়ায় একটি চক্রাকার রিং বা গোলাকার দাগ দেখা যায়। প্রতি বছর শিং-এ একটি করে এরূপ দাগের সৃষ্টি হয়। বয়স নির্ণয়ের সময় শিং-এ যে কয়টি দাগ দেখা যায় তার সঙ্গে দুই যোগ করে সাধারণত গরু ও মহিষের বয়স নির্ণয় করা হয়। এখানে গরুর বয়স নির্ণয়ের সূত্রটি দেয়া হলোঃ

গরুর বয়স (বছর) = শিং-এর চক্রাকার রিং বা দাগের সংখ্যা + ২

সারমর্ম

গরুমহিষ লালনপালন করার জন্য এদের বয়স নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে পশুর দৈহিক বৃদ্ধি, উৎপাদন ও কর্মক্ষমতার যোগসূত্র রয়েছে। দাঁত দেখে সব সময় সঠিকভাবে পশুর বয়স নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। কিন্তু এদেশে গবাদিপশুর বয়স নির্ণয়ে এ পদ্ধতিটিই বহুল প্রচলিত। রোমন্থনকারী পশুর দু'ধরনের দাঁত থাকে। যথা– অস্থায়ী ও স্থায়ী দাঁত। অস্থায়ী দাঁতকে দুধে দাঁত বা পতনশীল দাঁত বলে। গরুমহিষের অস্থায়ী ও স্থায়ী দাঁতের সংখ্যা যথাক্রমে ২০ ও ৩২টি। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি গবাদিপশুর উপরের চোয়ালের সামনের দিকে কোনো দাঁত নেই। বরং সেখানে একটি শক্ত প্যাড থাকে। কর্তন দাঁত চারভাগে বিভক্ত। যথা– কেন্দ্রিক, প্রথম মধ্যক, দ্বিতীয় মধ্যক ও কৌনিক। প্রাক-পেষণ ও পেষণ দাঁতকে একসঙ্গে চোয়ালের দাঁত বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কত বছরের মধ্যে গরু মহিষের কৌনিক কর্তন দাঁত ক্ষয় হয়?
ক) ১১ বছরের মধ্যে
খ) ৭ বছরের মধ্যে
গ) ৫ বছরের মধ্যে
ঘ) ২ বছরের মধ্যে

২. রোমন্থনকারী পশুর কত ধরনের দাঁত থাকে?
ক) ২ ধরনের খ) ৩ ধরনের
গ) ৪ ধরনের ঘ) ৫ ধরনের

৩. গরুর উপরের চোয়ালের সামনের দিকে কয়টি দাঁত বিদ্যমান?
ক) ২০ টি খ) ৩০ টি
গ) ৩২ টি ঘ) কোনো দাঁত নেই

পাঠ ৭.২

পশু নিয়ন্ত্রণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গরুমহিষকে কেন নিয়ন্ত্রন করা হয় তা বলতে পারবেন।
- গরুমহিষকে আটকানোর আড়পাতা পদ্ধতিটি বর্ণনা করতে পারবেন।
- গরুমহিষকে মাটিতে শোয়ানোর পদ্ধতিগুলো লিখতে পারবেন।

গরু ও মহিষ আমাদের দেশে ভারবাহী পশু হিসেবে পরিচিত। প্রাচীনকালে পশুরা বনেজঙ্গলে চরে বেড়াতো। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে আবির্ভাবের পর থেকেই মানুষ নিজের প্রয়োজনে গরুমহিষকে গৃহে লালনপালন করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। কিন্তু তারপরেও পশুদের মধ্যে পুরনো জংলী অভ্যাস ও আচরণগুলো বিদ্যমান। এসব আচরণকে আমরা পশুদের দোষ বা ভাইস (Vice) বলে থাকি। তা সত্ত্বেও গৃহে বা খামারে লালনপালন করতে হলে বিভিন্ন সময় পশুকে ধরতে হয়, তার কাছে যেতে হয় এবং চিকিৎসাসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করতে হয়। মানুষের বিভিন্ন কাজে পশুকে ব্যবহার করা হয়। এসব কারণেই পশুকে নিয়ন্ত্রণ করা বা আটকানোর বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ। পশু নিয়ন্ত্রণের কতকগুলো পদ্ধতি বা কলাকৌশল এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

আড়পাতা পদ্ধতি

পশু পালনকারী বা চিকিৎসকের জন্য এ পদ্ধতিতে গরুমহিষকে আড়পাতা বা ধরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। বিভিন্ন প্রয়োজনে আমাদের দেশে গরুমহিষের খামারগুলোতে এ পদ্ধতিতে এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। একটি নির্দিষ্ট সুবিধাজনক স্থানে আড়পাতা হয়। এ আড় লোহা, কাঠ বা বাঁশের তৈরি হতে পারে। প্রধানত পায়ুপথ ও যোনিপথ পরীক্ষা করার সুবিধার জন্য শূটের শেষ প্রান্ত বা পেছন দিকে যথেষ্ট জায়গা থাকে।

> গবাদিপশুকে মাটিতে ফেলার পূর্বে অবশ্যই স্থানটি দেখে নিতে হবে যাতে পশু মারত্মক কোনো আঘাত না পায়।

গবাদিপশুকে শোয়ানো

রুগ্ন গবাদিপশুর পরীক্ষা বা অস্ত্রোপাচার সুষ্ঠুভাবে করার জন্য পশুকে মাটিতে শুইয়ে নিয়ন্ত্রণ করা উত্তম পদ্ধতি। তবে গবাদিপশুকে মাটিতে ফেলার পূর্বে অবশ্যই স্থানটি দেখে নিতে হবে যাতে পশু মারত্মক কোনো আঘাত না পায়। পশুদের যে কোনো পার্শ্ব মাটির দিকে ফেলা যায়। তবে বাম দিকে ফেলাই শ্রেয়। সাধারণত দঁড়ির সাহায্যে গরুমহিষকে বেঁধে মাটিতে শোয়ানো হয়। দঁড়ির একপ্রান্ত পশুর শিংয়ের গোড়ায় বেঁধে তিনবার গেরো দিয়ে শরীরে বেষ্টনি পড়ানো হয় এবং রশির অন্যপ্রান্ত পেছন থেকে দৃঢ়ভাবে টেনে ধরলে পশু আপনা আপনি পিছনের দিকে নুয়ে পড়ে। রশির গেরো গরুমহিষকে মেরুদন্ড বরাবর দিতে হয়। এতে পশুর কিছু ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সে কারণে যত্নসহকারে এটি করতে হয়। অন্য একটি পদ্ধতিতে গরুর পেটের মাঝামাঝি মেরুদন্ড বরাবর একটি শক্ত রশি পরানো হয়। রশির একপ্রান্ত সামনের পায়ের চারদিকে এবং অন্যপ্রান্ত পিছনের পায়ের চারদিকে ঘিরে ধরতে হয়। অতঃপর দু'দিক থেকে পিঠ বরাবর রশি টেনে ধরলে পশু হঠাৎ করে একপাশে শুয়ে পড়ে। এতে গরুমহিষের

ক্ষতি হতে পারে। অতএব এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এছাড়াও কম ওজনের পশুকে পিছনের দু'পায়ে বেঁধে হ্যাচকা টানে মাটিতে ফেলা যায়। তবে এক্ষেত্রে যে স্থানে পশুকে ফেলা হবে তা যেন নরম হয়। গাভী অন্তঃসত্ত্বা হলে তাকে প্রথম পদ্ধতিতে শোয়ানো যায়। তবে এ অবস্থায় গাভীকে সব সময় বাম দিকে শুইয়ে দিতে হয়।

গোশালায় সার্বক্ষণিক বেঁধে রেখে গরুমহিষ লালনপালন করার যে কৌশল অবলম্বন করা হয় তাতে এদেরকে উপরোক্ত কোনো পদ্ধতিতেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। যে জায়গায় গরু বা মহিষটির অবস্থান সেখানেই আড়পাতা পন্থায় তাকে সব সময় থাকতে হয়। অসুস্থ হলে বা অন্য কোনো প্রয়োজনে যে শিকল পশুর গলায় সব সময় লাগানো থাকে তার একাংশ টেনে নিয়ে পশুর নাকে লাগানো আংটার সংঙ্গে একটি প্যাঁচ দিয়ে উপরে টেনে শিংয়ের সঙ্গে আরেকটি প্যাঁচ দিয়ে আটকে দিলেই পশু আর তেমন নড়াচড়া করতে পারে না। এ পদ্ধতি ইউরোপের বড় খামারগুলোতে চালু আছে। এ কৌশল কিছুটা অসহায়ত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও এভাবেই ওসব দেশে পশু আটকানো হয়। চিকিৎসক ও সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি একজন সাহায্যকারীর সাহায্যে একাজ করে থাকেন।

সারমর্ম

গৃহে লালনপালন করার জন্য পশুকে ধরতে হয়, তার কাছে যেতে হয় এবং চিকিৎসাসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করতে হয়। তাই আমাদের দেশে গরুমহিষের খামারগুলোতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পশুকে আটকানোর প্রয়োজন পড়ে। এর মধ্যে আড়পাতা বা শূট পদ্ধতিতে গরুমহিষকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। রুগ্ন পশুর পরীক্ষা বা অস্ত্রোপাচার সুষ্ঠুভাবে করার জন্য পশুকে মাটিতে শুইয়ে নিয়ন্ত্রণ করা উত্তম পদ্ধতি। সাধারণত দাঁড়ির সাহায্যে গরুমহিষকে বেঁধে মাটিতে শোয়ানো হয়। গাভী অন্তঃসত্তা হলে তাকে বাম দিকে শোয়াতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. পশুর মধ্যকার পুরনো জংলী অভ্যাস ও আচরনকে কী বলে?
ক) পশুর অস্বাভাবিকতা
খ) দোষ বা ভাইস
গ) বদ মেজাজ
ঘ) কোনটিই নয়

২. গরু মহিষকে সাধারনত কিসের সাহায্যে বেঁধে মাটিতে শোয়ানো হয়?
ক) দড়ি
খ) শিকল
গ) কাপড়
ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ ৭.৩

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: খরা ও বন্যায় পশু সংরক্ষণে করণীয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খরার সময় গবাদিপশু সংরক্ষণে করনীয় কী তা বলতে পারবেন।
- বন্যার সময় গবাদিপশু সংরক্ষণে কী কী করনীয় তা লিখতে পারবেন।

আমাদের দেশের মানুষ এবং গবাদিপশু বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন– খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি দ্বারা প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা পুষিয়ে নেয়ার জন্য দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এই পাঠে খরা ও বন্যায় গবাদিপশু সংরক্ষণে কী কী করণীয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

খরায় গবাদিপশু সংরক্ষণে করণীয়

বন্যার সময় বাংলাদেশ যেমন বন্যাকবলিত হয়ে পড়ে তেমনি খরার সময়ও দেশের অধিকাংশ এলাকা খরা কবলিত হয়ে পড়ে। এ সময় জনজীবন যেমন দুর্বিষহ হয়ে যায় তেমনি কৃষকেরা গবাদিপশু নিয়ে বিপাকে পড়ে। কারণ খরা মৌসুমে মাঠঘাট, নদীনালা, খালবিল সব শুকিয়ে যায়। ফলে গবাদিপশুর খাদ্য সমস্যা দেখা দেয় এবং গবাদিপশু বিভিন্ন প্রকার রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।

খরার পূর্বে বা সময় গবাদিপশু সংরক্ষণে যেসব বিষয় অবশ্য করণীয় সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে।

১. সাইলেজ বা ‘‘হে” এর ব্যবস্থা করাঃ যখন কাঁচা ঘাস পর্যাপ্ত পরিমাণ পাওয়া যায় তখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘাস খরা মৌসুমের জন্য ‘‘সাইলেজ” ও ‘‘হে” করে সংরক্ষণ করা যায়। এটি পরবর্তীতে কাঁচা ঘাসের সম্পূরক খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ভালো ‘‘সাইলেজ” ও ‘‘হে”-তে কাঁচা ঘাসের মতো খাদ্যমান বজায় থাকে।

২. ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ানোঃ গবাদিপশুকে শুধু শুকনো খড় না দিয়ে ইউরিয়া দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করে খড় খাওয়ালে পশু শুকনো খড়ের চেয়ে অনেক বেশি পুষ্টি পাবে। ভুশি দিয়ে ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক তৈরি করেও গবাদিপশুকে খাওয়ানো যায়।

> শুষ্ক মৌসুমে কাঁচা ঘাসের বিকল্প হিসেবে বিভিন্ন গাছের পাতা খাওয়ানো যায়।

৩. গাছের পাতা খাওয়ানোঃ শুষ্ক মৌসুমে কাঁচা ঘাসের বিকল্প হিসেবে বিভিন্ন গাছের পাতা খাওয়ানো যায়। যেমন– ইপিল ইপিল, মান্দার, জিগা, ডেওয়া, কাঁঠাল ইত্যাদি। পুকুরপাড়, রাস্তার ধার, বাঁধের ধারে লাগালে শুকনো মৌসুমে এসব গাছের পাতা কাঁচা ঘাসের চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করে।

৪. দানাদার খাদ্যের ব্যবস্থা করাঃ দানাদার খাবার, যেমন- চাউলের কুঁড়া, গমের ভুশি, তিলের খৈল, ডালের খোসা, ঝোলাগুড় ইত্যাদি খরা মৌসুমের আগেই মজুদ রেখে খরা মৌসুমে গবাদিপশুকে খাওয়ানো যায়।

৫. রোগব্যাধির চিকিৎসাঃ খরার সময় গবাদিপশু বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই সকল ধরনের সংক্রামক রোগের টিকা আগেই দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। গবাদিপশু রোগে আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শমতো চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাঃ উকুন, মাছি, আটালি ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। গবাদিপশুকে নিয়মিত গোসল করাতে হবে।

৭. বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করাঃ এ সময় পশুর শরীরে পানির অভাব হতে পারে। তাই পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিষ্কার বিশুদ্ধ পানি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. অন্যান্যদের ব্যবস্থা ঃ সম্ভব হলে ভাতের মাড়, তরিতরকারির উচ্ছিষ্টাংশ, গম ও ডালের ভুশি খাওয়াতে হবে।

বন্যার সময় গবাদিপশু সংরক্ষণে করণীয়

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বন্যা অন্যতম। বন্যায় গবাদিপশুর যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হয়ে থাকে। বন্যার কারণে গবাদিপশুর রক্ষাণাবেক্ষণ ও খাদ্য সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। সেসঙ্গে বিভিন্ন রোগব্যাধিও আক্রমণ করে থাকে। তাই গবাদিপশু সংরক্ষণে বন্যার আগে থেকেই নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা উচিত।

১. আবাস ব্যবস্থা

বন্যাকবলিত এলাকা থেকে গবাদিপশুকে যথাসম্ভব সরিয়ে নিয়ে উঁচু জায়গায় রাখতে হবে। এজন্য রাস্তার ধার, বাঁধের উপর প্রভৃতিতে রাখা যেতে পারে। যতটুকু সম্ভব নিচু ও স্যাঁতস্যাঁতে জায়গা পরিহার করতে হবে। গবাদিপশুকে উঁচু জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ পানিতে থাকলে পশুর বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিবে। কাদায় থাকলে পায়ে ঘা হবে এবং পচা বিষাক্ত পানি খেলে ডায়রিয়া দেখা দিবে।

কাঁচা ঘাস ‘সাইলেজ’ বা ‘হে’ করে রেখে দিতে হবে।

২. কাঁচা ঘাসের ব্যবস্থা

বন্যার সময় সকল মাঠঘাট ডুবে যায়। ফলে কাঁচা ঘাসের অভাব দেখা দেয়। সে কারণে বন্যার আগেই কাঁচা ঘাস ‘সাইলেজ’ বা ‘হে’ করে রেখে দিতে হবে। এটি বন্যার সময় কাঁচা ঘাসের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে। তাছাড়া কলাগাছের ছালও খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩. বিচালি সংরক্ষণ করা

বন্যার সময় খড় বা বিচালি সংরক্ষণের জন্য উঁচু মাঁচা করে তার উপর পালা করে রাখতে হবে। যাতে খড় বন্যার পানিতে ভিজে পচে না যায় ও স্যাঁতস্যাঁতে না হয়। স্যাঁতস্যাঁতে খড় খাওয়ালে অনেক সময় পশুর বিষক্রিয়া এবং উদরাময় দেখা দিতে পারে। কারণ স্যাঁতস্যাঁতে খড়ে সহজেই ছত্রাক জন্মে।

৪. অন্যান্য খাদ্যের ব্যবস্থা

বন্যার সময় চালের কুঁড়া, গমের ভুশি, তিল বা সরিষার খৈল, ডালের খোসা, চিটাগুড় ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। ইউরিয়া দিয়ে খড় প্রক্রিয়াজাত করে এবং ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক তৈরি করেও খাওয়ানো যেতে পারে। এ সময় গবাদিপশুকে বিশুদ্ধ পানি খাওয়াতে হবে। কাঁচা ঘাসের অভাবে কচুরিপানা, দলঘাস, কলমিলতা ইত্যাদি পরিমিত মাত্রায় খাওয়ানো যেতে পারে।

৫. রোগব্যাধির চিকিৎসা

বন্যার সময় অধিকাংশ জায়গায় গবাদিপশুর সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। কারণ বন্যার পানিতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সংক্রামক রোগ সংক্রমিত হয়। এ সময় ক্ষুরারোগ, বাদলা, গলাফোলা, তড়কাসহ নানা ধরনের রোগের প্রকোপ বাড়ে। সে কারণে বন্যার আগেই এসব রোগের টিকা দিতে হবে। আর টিকা দেয়া না থাকলে জরুরি ভিত্তিতে টিকা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বন্যার সময় পশুর পেটে কৃমির আক্রমণ দেখা দেয়। তাই কৃমিনাশক ওষুধ প্রয়োজনমতো খাওয়াতে হবে। বন্যার সময় ও বন্যা পরবর্তীকালে গবাদিপশুর কোন ধরনের সমস্যা দেখা দিলে অভিজ্ঞ প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

> বন্যার সময় পশুর পেটে কৃমির আক্রমণ দেখা দেয়।

৬। মৃত গবাদিপশুর সৎকার

বন্যাজনিত কারণে মৃত গবাদিপশু মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

সারমর্মঃ

বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন– খড়া, বন্যা, জলোচ্ছাস আমাদের দেশের একটি স্বাভাবিক ঘটনা। প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে প্রতি বছর প্রচুর গবাদিপশু হতাহত হয়ে থাকে। এতে অর্থনৈতিকভাবে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এ ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য প্রাকৃতিক দূর্যোগের পূর্বে এবং পরে গবাদিপশুর জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য সংরক্ষণ, উন্নত আবাসস্থল নির্মান, রোগব্যাধির চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন সময় পশুর পেটে কৃমির আক্রমন দেখা দেয়?
   ক) বন্যার সময়
   খ) খড়ার সময়
   গ) শীতের শুরুতে
   ঘ) শীতের শেষ প্রান্তে

২. স্যাঁতস্যাঁতে খড় খাওয়ালে পশুর কী হয়?
   ক) বিষক্রিয়া ও উদরাময়
   খ) কাঁশি
   গ) দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়
   ঘ) পশু অবশ হয়ে পড়ে

৩. বন্যার সময় খড় সংরক্ষণের জন্য কোথায় রাখতে হবে?
   ক) উচুঁ মাচা করে
   খ) নৌকার মধ্যে
   গ) মাটির গর্তে
   ঘ) কোনটিই নয়

চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ৭

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১. গরুর স্থায়ী ও অস্থায়ী দাঁতের বর্ণনা দিন।
২. গবাদিপশুর ওজন নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা কী?
৩. শিং দেখে কীভাবে গবাদিপশুর বয়স নির্ণয় করা যায়?
৪. খড়ার সময় গবাদিপশু সংরক্ষণে করনীয় কী?
৫. বন্যার সময় গবাদিপশু সংরক্ষণে করনীয় কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. গরুর স্থায়ী ও অস্থায়ী দাঁত কয়টি?
২. আড়পাতা পদ্ধতি কী?
৩. গরুর বিভিন্ন প্রকার স্থায়ী দাঁতের নাম উল্লেখ করুন।
৪. বন্যার সময় গরুর আবাস ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত?
৫. বিচালি কী? এর ব্যবহার উল্লেখ করুন।

উত্তরমালা – ইউনিট– ৭

পাঠ ৭.১

১। খ ২। ক ৩। খ

পাঠ ৭.২

১। খ ২। ক

পাঠ ৭.৩

১। ক ২। ক ৩। ক